দ্বিতীয় উপচ্ছেদ : নাটক

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজক প্রভাবে কলকাতায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচিত ও মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে, ছোট বড়ো অনেক নাট্যকার সেই উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু নাটক সাময়িক আবেগ ও দেশপ্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছিল, পেশাদারী নাটমঞ্চেরও বেশ উন্নতি হয়েছিল। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে দুজনের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, একজন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অপরজন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (নাটকের ক্ষেত্রে যিনি নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর ডি. এল. রায় নামে পরিচিত) ভালো ছাত্র হিসেবে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যয়নের অবকাশে তিনি পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। অবশ্য এর পূর্বেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার উদ্‌গম হয়েছিল, বিদেশে গিয়ে তিনি স্বদেশীভাব নিয়ে ইংরেজী কবিতা লিখে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছিলেন। পরবর্তিকালে দেশে ফিরে সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অবশ্য প্রথমে তাঁর আবির্ভাব হয় প্রহসনকার হিসেবে, তারপর তিনি যথার্থ নাটক লিখে বাংলা ও বাংলার বাইরে জনপ্রিয় নাট্যকাররূপে সম্মান লাভ করেন। ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও ডি. এল. রায়ের নাটকের অনুবাদ হয়েছে। তাঁর গীতিকাব্যসংগ্রহ ও হাসির গান ও কবিতার সঙ্কলন বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভাঙতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বিশেষতঃ তাঁর হাসির গান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন কয়েকখানি প্রহসন নিয়ে। 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১৯) প্রভৃতি প্রহসনগুলি একদা অভিনয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল—অবশ্য সবগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। 'কল্কি অবতার' এবং 'বিরহে'র হাস্যপরিহাস মোটামুটি মন্দ হয়নি, কিন্তু তাঁর হাসির গানের তুলনায় রঙ্গনাট্যগুলিতে রঙ্গরহস্য বেশী খোলেনি। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নানা কারণে রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) নামে একখানি রঙ্গপ্রহসনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে রুচিবান পাঠক ও দর্শকের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। মারমুখী জনতার প্রতিবাদে প্রথম অভিনয়ের রাত্রিতেই কর্তৃপক্ষ এই নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন, নাট্যকারও (যিনি উপস্থিত ছিলেন) কিছু অপমানিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত এবং কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রহসন হিসেবে 'আনন্দবিদায়' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক আবহাওয়াকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকগুলিতে

পৌরাণিক কাহিনীকে নতুনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা দেখা যায়—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার জন্যই তিনি ভক্তিরসে পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে খানিকটা আধুনিক ছাঁচে ঢেলে নিয়েছেন। ফলে পৌরাণিক চরিত্রে আধুনিক যুগের ভাববৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু নাটকীয় অভিনয়-যোগ্যতায় এগুলি বিশেষ ঐশ্বর্যবান নয়। তাঁর দুখানি সামাজিক ও পারিবারিক নাটক ('পরপারে'—১৯১২, 'বঙ্গনারী'—১৯১৬) খুব সার্থক না হলেও উত্তেজক ঘটনায় (খুন-জখম-ফাঁসি ইত্যাদি) পূর্ণ বলে একদা কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু এ দুটির নাট্যলক্ষণ বিশেষ নেই, সাহিত্যলক্ষণ আরও কম।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাংলা ও বাংলার বাইরে পরিচিত হয়েছেন, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, এর কারণ তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'প্রতাপ-সিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবারপতন' (১৯০৮) এবং 'সাজহান' (১৯০৯)—রাজপুত বীরত্ব ও মুঘলযুগের কাহিনী-গুলিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি হিন্দুযুগের—দুখানি নাটক রচনা করেন, 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। এর মধ্যে 'নূরজাহান', 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' সে যুগে কি রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তার সাক্ষ্য দিতে পারেন। এখনও পেশাদারী ও সৌখীন নাট্যসমাজে দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। বাংলার বাইরে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় এই সমস্ত নাটক অনূদিত হয়ে বাঙালীর নাট্যপ্রতিভাকে জয়যুক্ত করেছে। ১৯০৫ সালের স্বাদেশিক উত্তেজনাপূর্ণ আত্মত্যাগের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই বীর-রসাত্মক উদ্দীপনাসঞ্চারকারী আদর্শবাদের অপূর্ব নাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, নিজের নাট্যপ্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন এবং গিরিশচন্দ্রের সুলভ ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের স্থলে রণরঙ্গমুখর ইতিহাসকে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনে নাটকের ক্ষেত্রে একপ্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন। নূরজাহানের ক্ষমতালাভের সঙ্গে নারীহৃদয়ের দ্বন্দ্ব, সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার বিরোধ, পরিশেষে পিতৃসত্তার জয়-লাভ, 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্যচরিত্রের হৃদয় ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নাট্যকার অতি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের রৌদ্র রসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত হলেও সমসাময়িক ঘটনা ও জনরুচির তাড়নায় তিনি প্রায় কোথাও ইতিহাসকে বিকৃতি করেননি। অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে বাধ্য হয়ে তাঁকে খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানতঃ এবং বিনা কারণে তিনি ইতিহাসকে অতিক্রম করেননি। এই রকম একটা অভিযোগ চলে আসছে বটে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি নাটকের অনুরোধে ইতিহাসকে বদলে নিয়েছেন। অবশ্য শেক্সপীয়রও নাটকের জন্যই ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন, ইতিহাসের জন্য নাটক লেখেননি। আমাদের নাট্যকারও সেই রীতিতে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, একটু-আধটু ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলে তাতে নাটক বা ইতিহাসের মারাত্মক ক্ষতি হয় না। সব দিক বিবেচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার বলা যেতে পারে।

তাঁর এই ধরনের নাটকের চরিত্রচিত্রণরীতি, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতিতে শেক্সপীয়রীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শেক্সপীয়রের ভক্তপাঠক। কিন্তু আবেগতরল এবং উত্তপ্ত বাগ্‌ধারা ভাষারীতির উত্থানপতন (ক্লাইমাক্স-অ্যান্টিক্লাইমাক্স), অপূর্ব কাব্যধর্মী গমগমে সংলাপ—এসব তিনি জার্মান নাট্যকার শীলারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর নাটকে অভিনয়ের অতিরিক্ত পাঠযোগ্য সাহিত্যগুণও খুব উচ্চস্তরের হয়েছে। গিরিশচন্দ্রকে ছেড়ে দিলে তাঁকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার পথিকৃৎ বলতে হবে। ইতিহাসকে এমনভাবে চাক্ষুষ করে তোলা, ঐতিহাসিক নরনারীকে জীবন্ত করা এবং তারই সঙ্গে সমসাময়িক বাংলাদেশের সঙ্গে নাটকগুলির আন্তরিক যোগস্থাপন করা —এতে তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সীমা ও প্রভাব সম্বন্ধেও অনবহিত হয়ে থাকা যায় না। অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও কোন কোন স্থলে তাঁর চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত কৃত্রিম বলে মনে হয়, গালভরা শব্দবিন্যাসও শূন্যগর্ভ হয়ে ওঠে। ভাষার কৃত্রিমতা ও অতিনাটকীয়তা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মৌলিক ত্রুটি। সংলাপের দ্বারা নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কুশীলবেরা সকলেই এক ধরনের কাব্যময় অলঙ্কারবহুল ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করে যে, চরিত্রগুলির সংলাপজনিত স্বাতন্ত্র্য মুছে যায়। উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক সময়ে নাটকীয় পরিস্থিতির বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই ত্রুটিগুলি বোধ হয় শীলারের প্রভাবে এসে থাকবে, কারণ শীলারের নাটকেও এই ত্রুটি আছে। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার তাতে সন্দেহ নেই—তার বড়ো প্রমাণ, এখনও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ জাতীয় নাটকাভিনয় দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়ে থাকে। অবশ্য তাঁর নাটকের সংলাপের মধ্যে যে-ধরনের অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ঝঙ্কার আছে, তা পাঠক ও দর্শককে মুগ্ধ করলে বিস্ময়ের কারণ নেই। এখানে এই ধরনের দুটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

১. চন্দ্রগুপ্ত:

চাণক্য—জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না। [মুরাকে] কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চেনে না!—জানে না যে, জগতে যত পবিত্র জিনিস আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়!

চন্দ্রগুপ্ত—তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য—না, জানো না! নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—একপ্রাণ একমন, একনিঃশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল—তার পর পৃথক হয়ে এল—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মতো! মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরি করে তোমাকে পান করিয়েছিল—যে তোমার অধরে হাসা দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিসচুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা, রোগে শোকে, দৈন্যে, দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বুক পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান

মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ মন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে...এ সেই মা।

২. সাজাহান (শেষ দৃশ্য):

জাহানারা—ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম!

(মুখ ঢাকিলেন)

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ—কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে আমি করব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।...সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে ওঠে। তুমি আমার পিতাকে (অর্থাৎ দারা শিকোহ্) হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছ, সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও!

[সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির নত করিলেন]

২. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)

একদা কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও হালকা চালের রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য লিখে নাট্যামোদী দর্শক সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যেন নাট্যসাহিত্যের উন্নতি করবেন এবং দর্শকদের রুচির মোড় ফেরাবেন—এই ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন; ক্ষীরোদপ্রসাদের সে রকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে পেশাদার নাটকলিখিয়ে হিসেবেই তিনি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'কিন্নরী', 'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'রঞ্জাবতী', 'প্রতাপাদিত্য' এখনও জনপ্রিয়তা হারায়নি। তবে 'আলিবাবা' শীর্ষক গীতিনৃত্যবহুল চটুল নাটিকার জন্যই তিনি অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। নাটক ছাড়াও আরও নানা ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্যই প্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব তাঁর রচনায় বেশ পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও গীতিনৃত্যবহুল নাটিকা ও ঐতিহাসিক নাটকের জন্য তিনি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'আলমগীর' (১৯২১) প্রভৃতি নাটকে অভিনেতব্য নাটকের সার্থক দৃষ্টান্ত আছে। অবশ্য এই সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশী আবেগের বশে নাট্যকার এমন সমস্ত মেলোড্রামাটিক কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন যা আমাদের এখন হাস্যোদ্রেক করে। 'আলমগীর' অভিনয়ে উতরে গেলেও নাটক হিসেবে উচ্চস্তরের নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি কোন বৃহৎ আদর্শের জন্য কলম ধরেননি, জনমনোরঞ্জনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তাঁর নাটক-

গুলিতে অতিনাটকীয়তার বাড়াবাড়ি থাকলেও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের বাহ্য আড়ম্বর নেই। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'নরনারায়ণে'র অতিনাটকীয়তা, আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা বাদ দিলে অভিনয়ে এ নাটক মন্দ লাগে না। 'নরনারায়ণে'র কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বটি চমৎকার ফুটেছে, অবশ্য তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে'র ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'ভীষ্ম' প্রায় পুরোপুরি যাত্রার ঢঙে লেখা, আধুনিক রুচি এতে পীড়িত বোধ করবে। নাট্যকার তাঁর কালের অল্পশিক্ষিত এবং স্থূলরুচির জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করতে গিয়েছিলেন বলে অনেক নাটকীয় মুহূর্তকে সস্তা ভাবালুতার মোহে একেবারে মাটি করে ফেলেছেন। সংলাপ রচনায় এবং রঙ্গরহস্যে তিনি প্রাকৃতরুচির বেশী প্রশ্রয় দিতেন বলে মার্জিত মনের দর্শক-পাঠক তাঁর অধিকাংশ নাটক থেকে বিশেষ কোন তৃপ্তি খুঁজে পান না। তবে তাঁর 'আলিবাবা' (১৮৯৭) এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরব্য-উপন্যাসের সুপরিচিত আখ্যানকে অসাধারণ কৌশলে নৃত্যগীতিমুখর অপেরার ধাঁচে ঢেলে সেজে আবার তার সঙ্গে নাটকীয় বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলা নাটকে অদ্ভুত বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর যুগে তো বটেই, এখনও এ লঘু নাটকটির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে। অসম্ভব অদ্ভুত কাহিনী রঙ্গকৌতুক, ভাষার মজাদার কায়দা প্রভৃতি এ নাটকে অভিনয়ে অসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যে লঘুচিত্ততা তাঁর অন্যান্য 'সীরিয়াস' নাটকে দোষের কারণ হয়েছে, এই নাটিকায় সেটাই হয়েছে গুণ। তিনি তথাকথিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের বহর কমিয়ে যদি 'আলিবাবা'র মতো আরও খানকতক হাল্কা-চালের নাটক লিখতেন, তা হলে বাংলা নাট্যসাহিত্য লাভবানই হত।

৩. সমসাময়িক নাট্যকার